আগের যুদ্ধ আবার লড়তে যাবেন না

মনস্তাত্ত্বিক গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল

যে জিনিসটা আপনাকে প্রায়ই ভারাক্রান্ত করে এবং এবং দুর্দশার সাগরে ডুবিয়ে দেয় তা হলো আপনার অতীত যা কোনো পদ্ধতি বা কৌশলের প্রতি অপ্রয়োজনীয় আসক্তি, জীর্ণ হয়ে যাওয়া রীতিনীতির পুনরাবৃত্তি এবং পুরোনো জয়-পরাজয়ের স্মৃতি হিসেবে আপনার কাছে হাজির হয়। আপনাকে সচেতনভাবে অতীতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং নিজেকে বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য করতে হবে। সুতরাং নিজের প্রতি কঠোর হোন। পুরনো সব ক্লান্তিকর পদ্ধতি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবেন না। কখনও কখনও আপনাকে জোর করে হলেও নতুন দিকে এগোতে হবে যদিও তাতে ঝুঁকি থাকে। এতে সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা কিছুটা হারালেও আপনি তাতে বিস্ময়করসব ফলাফল লাভ করবেন যা আপনার শত্রুদের জন্য আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ অনুমান করা আরও কঠিন করে তুলবে। তাই আপনার মনের ওপর গেরিলা যুদ্ধ চালান এবং যেকোনো ধরণের যেকোনো উন্মুক্ত দূর্গ বা স্থির প্রতিরক্ষা রেখা মুছে দিন। সবকিছুই হোক প্রবাহমান ও গতিশীল।

> *তত্ত্ব কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মুলা দিতে পারে না। এটি কোনো সংকীর্ণ পথ চিহ্নিত করে তার দু'পাশে নীতির বেড়া দাঁড় করিয়ে বলতে পারে না যে— কেবল এই পথেই সমাধান রয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব মনকে বিভিন্ন ঘটনার বিশাল ভাণ্ডার এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে যা মনকে আরও উচ্চতর স্তরের কর্মকাণ্ডের জগতে উন্নীত করে। সেখানে মন তার সহজাত প্রতিভাকে পূর্ণ ক্ষমতায় করতে পারে এবং সবকিছুকে একত্রিত করে সঠিক ও সত্যকে এমনভাবে ধরতে পারে যেন তা একটি কেন্দ্রীভূত চাপ থেকে জন্ম নেওয়া একটিমাত্র স্বচ্ছ ধারণা যা বহু ভাবনার ফসল নয় বরং তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জের প্রতি একক প্রতিক্রিয়া।*
>
> - অন ওয়ার (On War), কার্ল ফন ক্লজভিট্জ (১৭৮০–১৮৩১)

শেষ যুদ্ধ

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯–১৮২১)-এর চেয়ে দ্রুত ক্ষমতায় আরোহণ আর কেউ করেনি। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয় এবং ১৭৯২ সালে কিং লুইসের পতন ঘটে। ১৭৯৩ সালে নেপোলিয়ান ফরাসি বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হন। ১৭৯৬ সালে তিনি ইতালিতে অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরাসি বাহিনীর নেতা হন, যাদেরকে তিনি সে বছরই এবং তিন বছর পর আবার চূর্ণবিচূর্ণ করেন। তিনি ১৮০১ সালে ফ্রান্সের প্রথম কনসাল এবং শেষমেষ ১৮০৪ সালে সম্রাটই হয়ে যান। ১৮০৫ সালে অস্টারলিট্জের[১] যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়ান ও রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে অপমানজনকভাবে পরাজিত করেন করেন।

অনেকের কাছে নেপোলিয়ন শুধু একজন শ্রেষ্ঠ জেনারেলই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক জিনিয়াস এবং গড অফ ওয়ার। তবে সবাই তার দ্বারা মুগ্ধ ছিলেন না। তাদের মধ্যে ছিলেন কিছু প্রুশিয়ান[২] জেনারেল যারা মনে করতেন

---

১ অস্টারলিট্জের(Asterlitz) যুদ্ধের পর ইউরোপে ব্রিটেন ছাড়া নেপোলিয়নকে মোকাবেলা করার মতো কোনো শক্তি বজায় থাকেনি। পরবর্তীতে অহঙ্কারী নেপোলিয়ন ১৮১২ সালে রাশিয়া দখলের চেষ্টা করেন। রাশিয়ার নিষ্ঠুর ঠান্ডা আর রাশিয়ানদের অনবরত হামলার ফলে তার বিশাল সেনাবাহিনী চুরমার হয়ে যায়। ব্যর্থ হয়ে তিনি ইউরোপ ফিরে আসার পর ব্রিটেন ও প্রুশিয়া আবার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেয়। শেষমেষ ১৮১৫ সালে তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে ব্রিটিশ ও প্রুশিয়ান বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। ব্রিটিশরা সুদূর সেন্ট হেলেনো দ্বীপে নির্বাসন দেয়।

২ বর্তমান জার্মানি ১৮৭১ এর আগে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিভক্ত ছিলো। এর মধ্যে প্রুশিয়া ছিলো সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় রাজ্য। ১৮৭১ সালে বিসমার্কের অধীনে জার্মানভাষী সব রাজ্য একত্রিত হয়ে আধুনিক জার্মানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে।

এগুলো জাস্ট তার ভাগ্য। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল নেপোলিয়ন যেখানে ছিলেন বেপরোয়া ও আক্রমণাত্মক সেখানে তার প্রতিপক্ষরা সেখানে ছিল ভীরু ও দুর্বল। ফলে তিনি যুদ্ধগুলো সহজেই জয় করে নিতে পারতেন। প্রুশিয়ান জেনারেলরা বিশ্বাস করতেন, যদি নেপোলিয়ন কখনো প্রুশিয়ান আর্মির মুখোমুখি হতেন, তবে তিনি এক মহা ভণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হতেন এবং তার দিগ্বীজয়ের নেশা ঘুচে যেত।

এই প্রুশিয়ান জেনারেলদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রেডরিখ লুডভিগ, যিনি হোহেনলোয়ে-ইঙ্গেলফিঙ্গেনের প্রিন্স (১৭৪৬–১৮১৮)। হোহেনলোয়ে জার্মানির অন্যতম প্রাচীন অভিজাত পরিবার থেকে এসেছিলেন যাদের এক গৌরবময় সামরিক ইতিহাস ছিলো। তিনি খুব অল্প বয়সেই তার মিলিটারি ক্যারিয়ার শুরু করেন ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের (১৭১২–৮৬) অধীনে—যিনি একাই প্রুশিয়াকে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। হোহেনলোয়ে পদোন্নতি পেতে পেতে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে জেনারেল হয়ে যান— অথচ প্রুশিয়ান মিলিটারি স্ট্যান্ডার্ডে তিনি তখনো তরুন।

হোহেনলোয়ের মনে করতেন যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে সংগঠন, শৃঙ্খলা, এবং প্রশিক্ষিত সামরিক মস্তিষ্ক দ্বারা তৈরি উৎকৃষ্ট কৌশলের ব্যবহারের ওপর। প্রুশিয়ানরা এসব গুণের সবকটিরই নিখুঁত উদাহরণ ছিল। প্রুশিয়ান সৈন্যরা নিরলসভাবে অনুশীলন করত যতক্ষণ না তারা জটিল কৌশলগুলো যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে পারত। প্রুশিয়ান জেনারেলরা ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের বিজয়গুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। তাদের কাছে যুদ্ধ ছিল এক গণিতসম বিষয় ও চিরন্তন নীতির প্রয়োগ। জেনারেলদের দৃষ্টিতে নেপোলিয়ন ছিলেন এক কোর্সিকান মাথানষ্ট ব্যক্তি যে এক অশৃঙ্খল নাগরিক বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। একবার নেপোলিয়ন প্রুশিয়ান জেনারেলদের মুখোমুখি হোক— জ্ঞান ও দক্ষতায় শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তারা তাকে কৌশলে হারিয়ে দিবেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রুশিয়ানদের মুখোমুখি হলে ফরাসিরা আতঙ্কিত হয়ে ভেঙে পড়বে আর নেপোলিয়নের ব্যাপারে প্রচলিত কল্পকাহিনী ধূলিস্যাৎ হবে এবং ইউরোপ ফিরে যাবে তার পুরনো ব্যবস্থায়।

১৮০৬ সালের আগস্টে হোহেনলোয়ে এবং তার সহকর্মী জেনারেলরা শেষ পর্যন্ত তাদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়ে গেলেন কারণ প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডরিখ উইলহেম দ্য থার্ড নেপোলিয়ন কর্তৃক ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এসময়ের মধ্যে তিনি তার জেনারেলদের বললেন ফরাসিদের ধ্বংস করতে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে।

হোহেনলোয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই অভিযান হবে তার যুদ্ধজীবনের শিখর। নেপোলিয়নকে কীভাবে পরাজিত করা যায়, তিনি বছরের পর বছর ধরে ভাবছিলেন। জেনারেলদের প্রথম স্ট্র্যাটেজি বৈঠকে তিনি তার পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন- নির্ভুল মার্চ সেনাবাহিনীকে এমন একটি নিখুঁত কোণে স্থাপন করবে যেখান থেকে তারা দক্ষিণ প্রুশিয়া দিয়ে অগ্রসর হওয়া ফরাসিদের আক্রমণ করতে পারবে। তির্যক ফরমেশনে[৩] আক্রমণ যা ছিলো ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের প্রিয় কৌশল তা ফরাসিদের ওপর বিধ্বংসী আঘাত হানবে।

অন্যান্য জেনারেলরা, যাদের বয়স ছিল সত্তর কিংবা ষাটের কোঠায়, তাদের নিজেদের পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন, কিন্তু সেগুলোও কেবল ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের স্ট্র্যাটেজিসমূহেরেই বিভিন্ন সংস্করণ। ফলে আলোচনা তর্কে রূপ নিল এবং তাতেই কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। অবশেষে রাজাকেই হস্তক্ষেপ করে এমন একটি আপস-নির্ভর কৌশল তৈরি করতে হলো যা তার সব জেনারেলকে সন্তুষ্ট করবে।

---

৩ অতীতে যুদ্ধরত দুই পক্ষের সারিগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে সামনাসামনি লড়াই করতো। ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের কৌশল ছিলো তার সেনাবাহিনী শত্রপক্ষের কোণোকোণি দিক থেকে আক্রমন করবে। এতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তো।

তিনি(হেনরি দ্য জোমিনি[৪]) প্রায়ই একেবারেই ইচ্ছামত নেপোলিয়নের কাজগুলোকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, যেখানে তিনি নেপোলিয়নকেই সর্বদা সত্য হিসেবে দেখাতে চান। ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন ঠিক কীসের জন্য নেপোলিয়ন সত্যিকারের মহানায়ক ছিলেন। অথচ তার প্রকৃত যোগ্যতা দুঃসাহসী অভিযানগুলোতে লুকিয়ে ছিলো, যেখানে তিনি সব ধরনের তত্বকে ছুড়ে ফেলে প্রতিটি পরিস্থিতিতে যা সবচেয়ে উপযোগী মনে হতো, তাই করার চেষ্টা করতেন।

- ফ্রেডরিখ ফন বের্নহার্ডি, ১৮৪৯–১৯৩০

এক ধরনের উচ্ছ্বাস পুরো দেশ জুড়ে ছেয়ে গেল। সবাই বিশ্বাস করছিল, শিগগিরই প্রুশিয়ান আর্মি ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের গৌরবময় দিনগুলো পুনরুজ্জীবিত করবে। জেনারেলরা বুঝতে পেরেছিলেন যে নেপোলিয়ন তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে গেছে, কারণ তার কাছে দুর্দান্ত সব গুপ্তচর ছিল। কিন্তু প্রুশিয়ানদের আগেলগে শুরু করার একটা বিষয় ছিলো এবং একবার তাদের যুদ্ধের মেশিন চালু হয়ে গেলে তাকে থামানোর ক্ষমতা কারও থাকবে না।

৫ অক্টোবর, প্রুশিয়ান রাজা কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা করার কয়েক দিন আগেই জেনারেলদের কাছে উদ্বেগজনক খবর পৌঁছাল। একটি টহল মিশনে জানা গেল যে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশন পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে একত্রিত হয়েছে, এবং দক্ষিণ প্রুশিয়ার গভীরে সমবেত হচ্ছে— যেগুলোকে প্রুশিয়ান জেনারেলরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে বলে ভেবেছিল। টহল মিশনের নেতৃত্বদানকারী ক্যাপ্টেন জানান যে ফরাসি সৈন্যরা পিঠে রসদের বোঝা নিয়ে দ্রুত মার্চ করছে। যেখানে প্রুশিয়ানরা রসদ বহনের জন্য ধীরগতির ওয়াগনের ওপর নির্ভর করত, সেখানে ফরাসিরা নিজেদের সরঞ্জাম নিজেরাই বহন করত এবং অবিশ্বাস্য গতিতে ও চপলতায় চলাফেরা করত।

নেপোলিয়নের আকস্মিক অগ্রসরতায় হতবিহ্বল প্রুশিয়ান জেনারেলরা তাদের পরিকল্পনা সংশোধন করার আগেই, নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী হঠাৎ ঘুরে উত্তরের দিকে চলল, সোজা প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিনের দিকে। জেনারেলরা এদিক-ওদিক তর্ক-বিতর্ক ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে সৈন্যদের সরাতে লাগলেন, কোথায় আক্রমণ করা হবে তা ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলো। অবশেষে রাজা পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন যাতে সৈন্যরা উত্তরে পুনর্গঠিত হতে পারে এবং বার্লিনের দিকে অগ্রসরমান নেপোলিয়নের বাহিনীকে পার্শ্বদেশ থেকে আঘাত হানতে পারে। হোহেনলোয়ে ছিলেন পিছনের সেনাদলের দায়িত্বে, যার কাজ ছিল প্রুশিয়ানদের পশ্চাদপসরণকে নিরাপদ করে তোলা।

১৪ অক্টোবর, জেনা শহরের কাছে, নেপোলিয়ন এবং জেনারেল হোহেনলোয়ে মুখোমুখি হলেন। হোহেনলোয়ে অবশেষে সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন যেটার জন্য তিনি এত আগ্রহী ছিলেন। উভয় পক্ষের সংখ্যাই প্রায় সমান ছিল, কিন্তু ফরাসিরা ছিল এক অশৃঙ্খল বাহিনী যারা অগোছালোভাবে, এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে এবং পালাক্রমে লড়াই করছিল। অপরদিকে হোহেনলোয়ে তার সৈন্যদের সুশৃঙ্খল রাখলেন, তাদের নৃত্যদলদের মতো নিয়ন্ত্রণে রেখে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। লড়াই বারবার সামনের দিকে-পিছনের দিকে চলল, অবশেষে ফরাসিরা ভিয়েরজেনহাইলিগেন গ্রামটি দখল করল।

হোহেনলোয়ে তার সৈন্যদের গ্রামটি পুনরায় দখল করার আদেশ দিলেন। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের সময় থেকে চলে আসা প্রচলনের অংশ হিসেবে, একটি ছন্দোময় ড্রাম বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রুশিয়ান সৈন্যরা তাদের পতাকা উড়িয়ে নিখুঁত প্যারেড বিন্যাসে নিজেদের অবস্থান পুনর্গঠন করল এবং সারিবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হতে প্রস্তুত

---

৪ ব্যারন অঁতোয়ান হেনরি দ্য জোমিনি(১৭৭৯-১৮৬৯)। নেপোলিয়নের যুদ্ধকৌশলের লেখক। প্রথমে ফ্রান্স ও পরবর্তীতে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অধীনে কাজ করেছেন।

হলো। তারা ছিল একটি খোলা ময়দানে, আর নেপোলিয়নের সৈন্যরা বাগানের প্রাচীর এবং বাড়ির ছাদে অবস্থান করেছিল। প্রুশিয়ানরা ফরাসি লক্ষ্যভেদী বন্দুকধারীদের গুলিতে একের পর এক পড়তে লাগল। হতবিহ্বল হোহেনলোয়ে তার সৈন্যদের থামার এবং নতুন করে সারি সাজাতে আদেশ দিলেন। আবার ড্রামের ছন্দ বাজল, প্রুশিয়ানরা চমৎকার নিখুঁততার সঙ্গে পদযাত্রা শুরু করল, যা দেখতে অসাধারণ ছিল। কিন্তু ফরাসিরা অবিরাম গুলি চালিয়ে প্রুশিয়ান সারিটিকে ধ্বংস করে দিল।

হোহেনলোয়ে এর আগে কখনো এরকম সেনাবাহিনী দেখেননি। ফরাসি সৈন্যরা যেন রাক্ষসের মতো। তারা তার শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদের মতো বন্দুক হাতে নিয়ে সারি বেধে আগাচ্ছিলো না। বরং স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে নিজেদের মতো করে পজিশন নিয়ে গুলি চালাচ্ছিলো। তাদের এসব কান্ড পাগলামির মতো মনে হলেও এও মনে হচ্ছিলো এই পাগলামিটাও নতুন কোনো সামরিক পদ্ধতি। এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে, অনেকটা অদৃশ্য থেকেই ফরাসিরা দুই পাশ থেকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো এবং প্রুশিয়ানদের ঘিরে ফেলে পর্যুদস্ত করার মতো অবস্থার সৃষ্টি করল। উপায়ান্তর না দেখে হোহেনলোয়ে তার সেনাদের পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। জেনার যুদ্ধ এখানেই শেষ হলো।

চলমান যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় নেপোলিয়নের বাহিনীর সামনে তাসের ঘরের মতো প্রুশিয়ান আর্মি দ্রুত পর্যুদস্ত হতে থাকলো এবং দুর্গের পর দুর্গের পতন হলো। প্রুশিয়ান রাজা পূর্বের দিকে পালিয়ে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই, একসময়কার শক্তিধর প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

> *একবার একটি চামচিকা মাটিতে যাওয়ায় একটি গৃহ-নকুল তাকে ধরে ফেলে। মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে চামচিকাটি গৃহ-নকুলের কাছে তার প্রাণ-ভিক্ষা চাইলো। গৃহ-নকুল বলল যে সে তাকে ছাড়তে পারবে না, কারণ গৃহ-নকুলরা সব পাখির স্বাভাবিক শত্রু। চামচিকাটি উত্তর দিল যে সে নিজে পাখি নয়, বরং একটি ইঁদুর। তখন গৃহ-নকুল তাকে ছেড়ে দিলো। এভাবে চামচিকা নিজেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল।*
>
> *আরেকদিন আবার সে পড়ে গেলে আরেকটি গৃহ-নকুল ধরে ফেলে। সে পুনরায় প্রাণ-ভিক্ষা চাইলো যেন তাকে না খায়। দ্বিতীয় নকুল বললো যে সে সব ইঁদুরকে সম্পূর্ণ ঘৃণা করে। কিন্তু চামচিকাটি দৃঢ়ভাবে বলল যে সে ইঁদুর নয়, বরং চামচিকা। ফলে সে আবার ছাড়া পেল। এইভাবেই চামচিকাটি শুধুমাত্র নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে দুইবার নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। এই গল্পটি দেখায় যে সর্বদা একই কৌশলেই সীমাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন নেই। বরং, যদি আমরা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি, তবে বিপদ থেকে আরও ভালোভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।*
>
> -খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ঈশপের গল্প থেকে নেয়া।

ব্যাখ্যা

১৮০৬ সালে প্রুশিয়ানদের সামনে যে বাস্তবতা দাঁড়িয়েছিল, তা সহজ। তারা তখনকার সময়ের চেয়ে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে ছিল। তাদের জেনারেলরা বয়স্ক ছিলেন, এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে তারা অতীতে সফল হওয়া পদ্ধতিগুলোকেই পুনরায় ব্যবহার করছিলেন। তাদের সৈন্যরা ধীরগতিতে চলত এবং সৈন্যরা প্যারেডে রোবটের মতো অগ্রসর হতো[৫]। অথচ ওই পদ্ধতি ততদিনে সেকেলে হয়ে গিয়েছিলো যেখানে নেপোলিয়েন সম্পূর্ণ নতুন কৌশল এসেছে। তার সেনারা এই সারিবদ্ধ লড়াই না করে এদিক সেদিক দৌড়ে পজিশন নিয়ে, কেউ প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে, কেউ ছাদে উঠে গুলি করতো।

---

৫ যেটা এখনকার সময়ে আমরা বিভিন্ন মিলিটারি প্যারেডে সেনাদের পারফর্ম করতে দেখি।

প্রুশিয়ান জেনারেলদের সামনে আসন্ন বিপদের অনেক ইঙ্গিত ছিল। তাদের সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক যুদ্ধে ভালো পারফর্ম করেনি। বেশ কয়েকজন প্রুশিয়ান অফিসার সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নেপোলিয়ন, তার নতুন কৌশল এবং শত্রুদের ওপর তার বাহিনীর দ্রুত ও সহজে প্রভাব অর্জনের ক্ষমতাকে অধ্যয়ন করার জন্য তারা দশ বছর সময় পেয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা তাদের সামনে উপস্থিত ছিল, তবুও তারা তা উপেক্ষা করছিলো নিজেদেরকে এই বুঝ দিয়ে যে নেপোলিয়নই এসব যুদ্ধকৌশল তাদের সামনে টিকবে না।

আমরা হয়তো প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীকে কেবল একটি আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক উদাহরণ মনে করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেরাই প্রায় একই পথে এগিয়ে যাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে ও জাতি হিসেবে আমাদের সীমাবদ্ধতা হলো বাস্তবতার মুখোমুখি হতে না পারা, জিনিসগুলোকে যেমন তা আছে তেমন দেখতে না পাওয়া। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অতীতে আরও বেশি গেঁথে যাই। অতীতের অভ্যাস আমাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। যা কিছু অতীতে আমাদের জন্য কার্যকর হয়েছিলো, তা আমাদের জন্য মতবাদে পরিণত হয়। এটি এমন এক খোলসে রূপান্তরিত হয় যার কাজ হলো বাস্তবতা থেকে আমাদের "রক্ষা করা"। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি সৃজনশীলতাকে রিপ্লেস করে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের কাজগুলোও একই ধরণের হচ্ছে, কারণ আমাদের নিজেদের মনের মধ্যে যা ঘটছে তা দেখা প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ নেপোলিয়নের মতো লোকেরা নতুন সব কৌশল নিয়ে হাজির হয় যারা প্রাচীন পদ্ধতিকে সম্মান করে না এবং নতুনভাবে লড়াই করে। তখনই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের চিন্তা ও প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতি সময়ের সঙ্গে সেকেলে হয়ে পড়েছে।

আপনার অতীতের সফল পদ্ধতিসমূহ ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে বলে কখনো ধরে নেবেন না। প্রকৃতপক্ষে, আপনার অতীতের সাফল্যই আপনার সবচেয়ে বড় বাধা। প্রতিটি যুদ্ধ, প্রতিটি সংঘর্ষেরই আলাদা মেজাজ থাকে। ফলে আপনি ধরে নিতে পারবেন না যে পূর্বে যা কাজ করেছে, আজও তা কাজ করবে। আপনাকে অতীত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বর্তমানের দিকে চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ আপনার আগের যুদ্ধের কৌশল অনুযায়ী লড়াই করার প্রবণতা আপনাকে আপনার শেষ যুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে।

> *১৮০৬ সালে যখন প্রুশিয়ান জেনারেলেরা- ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের "অবলিক অর্ডার অফ ব্যাটল"[৬]- যুদ্ধকৌশলকে ব্যবহার করে বিপদের মুখে পড়লেন, তখন এটাকে কেবল একটি কৌশলের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়াই বলা যাবে না, বরং রুটিন হয়ে যাওয়ার কারণে চিন্তাশক্তির যে চরম দৈন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তারও এক উদাহরণ। ফলাফল- হোহেনলোয়ের অধীনে থাকা প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেল যে কোনো বাহিনী কখনোই কোনো যুদ্ধে এমনভাবে ধ্বংস হয়নি।*
>
> - অন ওয়ার, কার্ল ফন ক্লাউসেভিজ(১৭৮০–১৮৩১)

বর্তমান যুদ্ধ

১৬০৫ সালে, মাত্র একুশ বছর বয়সেই তলোয়ারবিদ হিসেবে সুনাম অর্জন করা জাপানের প্রসিদ্ধ সামুরাই মিয়ামোতো মুসাশিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হয়। আহ্বানকারী ছিলেন মাতাশিচিরো নামের এক তরুণ যিনি তলোয়ারবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ইয়োশিওকা বংশের লোক। একই বছরের শুরুর দিকে মুসাশি মাতাশিচিরোর বাবা গেনজায়েমনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কয়েক দিন পর আরেক দ্বন্দ্বে তিনি গেনজায়েমনের ছোট ভাইকেও হত্যা করেন। ফলে ইয়োশিওকা পরিবার প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

---

৬ অবলিক অর্ডার অফ ব্যাটলঃ সরাসরি সামনের দিক থেকে হামলা না করে শত্রুর পাশ থেকে তীর্যকভাবে হামলা করা। এতে শত্রুসেনাদের লাইনগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো এবং তারা পিছু হঠতে বাধ্য হতো।

আমি কখনোই কৌশলসংক্রান্ত কোনো তত্ত্বগ্রন্থ পড়িনি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা কোনো বই সঙ্গে করে নেই না।

— মাও সে-তুং (১৮৯৩–১৯৭৬)

মাতাশিচিরোর চ্যালেঞ্জে অগ্রিম বিপদ আঁচ করতে পেরে মুসাশির বন্ধুদের সন্দেহ হলো—এটি নিশ্চয়ই একটি ফাঁদ। তারা মুসাশির সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেও মুসাশি একাই রওনা দিল। এর আগের ইয়োশিওকা পরিবারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরি করে তাদের ক্ষিপ্ত করেছিল। কিন্তু এবার মুসাশি উল্টো করলো। সে আগেভাগেই পৌঁছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। তার মনে সন্দেহ, অতীতে পারিবারিক পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতে প্রতিশোধের চিন্তা থেকেই হয়তো এবার ইয়োশিওকা পরিবার তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছে।

মুসাশি গাছের আড়াল থেকে দেখে মাতাশিচিরো রীতিমত একটি ছোট বাহিনী নিয়ে নিয়ে চলে এসেছে। তাদের একজন মাতাশিচিরোকে বলল, “মুসাশি নিশ্চয়ই আগের মতো অনেক দেরিতে হাজির হবে। যাই হোক এবার তার সেই চাল আর চলবে না!”। ভালোরকমের একটা এম্বুশ পাতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাতাশিচিরোর লোকেরা ঘাসের মধ্যে শুয়ে লুকিয়ে পড়ল।

হঠাৎ মুসাশি গাছের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে চিৎকার করে উঠল, “অনেক অপেক্ষা করেছি। এবার তোমার তলোয়ার বের করো!”। এক ঝটকায় সে মাতাশিচিরোকে হত্যা করল। তারপর নিজেকে এমন কোণে স্থাপন করল যাতে বাকি লোকেরা সরাসরি তাকে ঘেরাও না করে ফেলতে পারে। মাতাশিচিরোর লোকেরা সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেও মুসাশির আকস্মিকতায় তারা এতটাই হতভম্ব ছিল যে তাকে ঘিরে ফেলার পরিবর্তে একটা এলোমেলো লাইনে দাঁড়িয়ে রইল। মুসাশি সহজেই সেই ভাঙা লাইন বেয়ে দৌড়ে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হতভম্ব সৈন্যদের একে একে হত্যা করে ফেললো।

এই বিজয়ের ফলে মুসাশি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তলোয়ারবাজ হিসেবে তার খ্যাতি স্থায়ী করে নিলেন। এরপর তিনি যোগ্য প্রতিপক্ষের সন্ধানে দেশজুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এরই মধ্যে জাপানের এক শহরে তিনি বাইকেন নামের এক অপরাজিত যোদ্ধার কথা শুনলেন যার অস্ত্র ছিল একটি কাস্তে[৭] এবং লম্বা একটি লম্বা শিকল যার শেষ প্রান্তে লাগানো ছিল লোহার গোলা। মুসাশি অস্ত্র দুটির ব্যবহার নিজের চোখে দেখতে চাইলেন, কিন্তু বাইকেন রাজি হলেন না। তিনি জানিয়ে দিলেন, এই অস্ত্রদুটি কীভাবে কাজ করে তা দেখার একমাত্র উপায় হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার মুখোমুখি হওয়া।

রিফ্রেশিং দ্য মাইন্ডস

আপনি ও আপনার প্রতিপক্ষ যখন এমন এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন যার শেষ দেখা যাচ্ছে না, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো কৌশল উদ্ভাবন করা অত্যন্ত আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মনকে সতেজ রেখে এবং লড়াই চলাকালীন আপনার কৌশল পরিবর্তন করে আপনি এমন এক সঠিক ছন্দ-সময়ের সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। আপনি ও আপনার প্রতিপক্ষ উভয়েই যখন স্থবির অবস্থায় পৌঁছে যাবেন, তখনই আপনাকে তার মোকাবিলার ভিন্ন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে তাকে অতিক্রম করা যায়।

- দ্য বুক অফ ফাইভ রিংস, মিয়ামোতো মুসাশি (১৫৮৪–১৬৪৫)

৭ Kama নামে পরিচিত জাপানিজ কাস্তে। এটি ফাইটিং ও মার্শাল আর্টে ব্যবহৃত হয়। গুগল দ্রষ্টব্য।

বাইকেনের পরোক্ষ চ্যালেঞ্জে আবারও মুসাশির বন্ধুরা বিপদ দেখতে পেলো। তারা মুসাশিকে নিরাপদে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। কারণ এই পর্যন্ত কেউই বাইকেনকে পরাজিত করতে পারেনি। তার অস্ত্রগুলো অপ্রতিরোধ্য ছিল। দ্বন্ধযুদ্ধের সময় সে আকাশে বলটি ঘুরিয়ে গতি বাড়িয়ে নিতো এবং তার শত্রুকে অনবরত চাপ দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দিত। তারপর বলটি শত্রুর মুখের দিকে ছুড়ে দিত। যে মুহূর্তে তার প্রতিপক্ষকে বল এবং চেইন ঘূর্ণন ও বলের আঘাত প্রতিরোধ করতে গিয়ে তলোয়ারধরা হাতটা চেইনে আটকে যেতো ঠিক সেই ক্ষণিক মুহূর্তেই বাইকেন তার কাস্তে দিয়ে শত্রুর গলার উপরে আঘাত করত।

মুসাশি তার বন্ধুদের সতর্কতা উপেক্ষা করে বাইকেনকে চ্যালেঞ্জ করল এবং লম্বা ও ছোট দুটি তরবারি নিয়ে তার তাঁবুতে উপস্থিত হল। বাইকেন কখনও কাউকে দুটি তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে দেখেনি। শুধু তাই নয়, বাইকেনকে আক্রমণ করার সুযোগ না দিয়ে মুসাশিই প্রথমে তাকে আক্রমণ করল এবং বাইকেনকে পিছু হটাতে বাধ্য করল। বাইকেন চেইনওয়ালা বলটি ছুড়তে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লো কারণ মুসাশি এক তরবারি দিয়ে এটি আটকিয়ে অন্য তরবারিটি দিয়ে আঘাত করতে পারবে। বাইকেন যখন সুযোগ খুঁজছিলো তখনই মুসাশি হঠাৎ ছোট তরবারি দিয়ে আঘাত করে তাকে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করে মুহূর্তের মধ্যেই লম্বা তরবারি দিয়ে আঘাত করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করল। এভাবেই মুসাশি এককালের অপরাজেয় বাইকেনকে পরাজিত করে।

কয়েক বছর পরে, মুসাশি একটি বিশাল সামুরাই সম্পর্কে জানতে পারলো যার নাম সাসাকি গানরিউ। সে খুব লম্বা তলোয়ার দিয়ে লড়াই করত। একটি চমৎকার সুন্দর এই বিশাল তরবারিটি দেখলে মনে হতো এ যেন কোনো যুদ্ধেরই তেজ ধারণ করে ফেলেছে। এই লড়াই হবে মুসাশির চূড়ান্ত পরীক্ষা। গানরিউ তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। দ্বন্দ্বটি সামুরাই গানরিউর বাড়ির কাছে একটি ছোট দ্বীপে অনুষ্ঠিত হবে।

> *জয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকা একটি রোগ। একইভাবে নিজের তলোয়ার চালানোর দক্ষতার ব্যাপারে সদা আত্মতুষ্টিতে থাকাও একটি রোগ। শুধু তাই নয়, আপনি যেসব কৌশল শিখেছেন সেগুলো ব্যবহার করার চিন্তায় মগ্ন থাকা কিংবা সদা আক্রমণের চিন্তায় স্থির থাকা- এগুলোও রোগ। এমনকি এই রোগগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার চিন্তায় আটকে থাকাও একটি রোগ। এখানে “রোগ” বলতে বোঝানো হচ্ছে ঐ মনকে যা একই জিনিসের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। যেহেতু এই সব রোগ আপনার মনের মধ্যেই আছে তাই মনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য আপনাকে এগুলো দূর করতে হবে।*
>
> — তাকুয়ান, জাপান, ১৫৭৩–১৬৪৫

দ্বন্ধযুদ্ধের দিন সকালে দ্বীপটিতে মানুষের ঢল নামলো। এমন দক্ষ যোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। গানরিউ সময়মতো উপস্থিত হলেও মুসাশি এলেন অনেক দেরিতে। এক ঘণ্টা কেটে গেল, তারপর আরেক ঘণ্টা। তাতেই গানরিউ রেগে আগুন। অবশেষে একটি নৌকা দ্বীপের দিকে আসতে দেখা গেল। নৌকার একজন যাত্রী আধোঘুমে শুয়ে কি যেনো করছেন। মনে হচ্ছিল, লম্বা একটি কাঠের বৈঠা ছাঁচছেন। তিনিই ছিলেন মুসাশি। তাকে দেখে মনে হলো মেঘের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় হারিয়ে গেছেন। নৌকা যখন তীরে পৌঁছাল তিনি একটি ময়লা টাওয়াল মাথায় বেঁধে নিলেন এবং নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দীর্ঘ বৈঠাটি উঁচিয়ে ধরলেন যা গানরিউর বিখ্যাত তলোয়ার থেকেও লম্বা। এই অদ্ভুত মানুষটি তলোয়ারের বিপরীতে বৈঠা নিয়ে এবং টাওয়ালকে হেডব্যান্ড বানিয়ে এসেছেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াইটা করতে।

গানরিউ রাগে চিৎকার করে বললেন, "তুমি কি আমাকে দেখে এত ভয় পেয়েছ যে আটটায় এখানে আসার প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলেছ?"

মুসাশি কিছু না বলে তার দিকে এগিয়ে এলেন। গানরিউ তার অসাধারণ তলোয়ারটি বের করলেন এবং সেটির খাপ বালিতে ফেলে দিলেন।

মুসাশি হাসলেন: "সাসাকি, তুমি নিজের পরাজয় নিশ্চিত করে নিলে!"

"আমি? পরাজিত? অসম্ভব!", গানরিউ রেগে গেলেন।

মুসাশি বললেন, "পৃথিবীর কোন বিজেতা তার তলোয়ারের খাপ সমুদ্রে ফেলে দিতে পারে?"

তার এই রহস্যময় মন্তব্য কেবল গানরিউকে আরও রাগী করে তুলল।

এরপর মুসাশি ধারালো বৈঠাটি সরাসরি তার শত্রুর চোখের দিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করলেন। গানরিউ দ্রুত তার তলোয়ার তুলে মুসাশির মাথায় আঘাত করা করলেন, কিন্তু আঘাতটি মিস গেলো। তাতে কেবল মুসাশির মাথার টাওয়ালের হেডব্যান্ডটি কেটে দুই টুকরা হয়ে গেলো। অথচ এর আগে কখনও তিনি মিস করেননি। প্রায় একই মুহূর্তে মুসাশি তার কাঠের তলোয়ার নামিয়ে এক আঘাতে গানরিউকে মাটিতে ফেলে দিলো। দর্শকরা হতবাক হয়ে গেলো। গানরিউ উঠার চেষ্টা করলেও মুসাশি মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করল।

এরপর লড়াই পরিচালনা করা ব্যাক্তিদের প্রতি নম্রভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি নৌকায় ফিরে এলেন এবং আগমনের মতোই শান্তভাবে চলে গেলেন।

এরপর থেকেই জাপানে মুসাশিকে এমন একজন তলোয়ারবাজ হিসেবে গণ্য করা হতো যাকে কোনো সমকক্ষ নেই।

> *যে কেউ কৌশল তৈরি করতে পারে, কিন্তু খুব কম মানুষই যুদ্ধ চালাতে সক্ষম। কারণ কেবল একজন প্রকৃত সামরিক প্রতিভাই পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনগুলো দক্ষভাবে সামলাতে পারে।*
>
> — নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ১৭৬৯–১৮২১

ব্যাখ্যাঃ

দ্য বুক অফ ফাইভ রিংস বইটির লেখক মিয়ামোতো মুসাশি তার সমস্ত ডুয়েল(দ্বন্ধযুদ্ধ) জিতেছিলেন একটি কারণে — প্রতিটি যুদ্ধে তিনি তার কৌশলকে তার প্রতিপক্ষ এবং ওই মুহূর্তের পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেন। মাতাশিচিরোর সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি ঠিক করলেন আগেলগেই আগমন করা উচিত, যা তিনি তার আগের লড়াইগুলোতে করেননি(যেহেতু এখানে পারিবারিক প্রতিশোধস্পৃহা বিদ্যমান তাই দ্বন্ধযুদ্ধের চেয়েও বেশী কিছু হয়তো লুকিয়ে আছে)। শক্তিশালী ও সংখ্যায় বেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য তাদেরকে হতবিহ্বল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। তাই তিনি গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন যখন তার প্রতিপক্ষরা ঘাসের মধ্যে শুয়ে ছিল। তারপর এক আঘাতেই তিনি তাদের নেতা হত্যা করলেন। তারপর তিনি এমন একটি কোণে অবস্থান নিলেন যা তাদেরকে ডাইরেক্ট তার দিকে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করল। ফলে তারা তাকে ঘিরে ফেলতে পারলো না। ঘিরে ফেললে তা তার জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক হত।

বাইকেনের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল খুবই সহজ— দুটি তলোয়ার ব্যবহার করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে এমনভাবে তার জায়গা দখল করা যে বাইকেন এই নতুন কৌশলের প্রতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো সময়ই না পায়। গানরিউর ক্ষেত্রে মুসাশি কাঠের তলোয়ার, উদাসীন আচরণ, ময়লা তোয়ালের হেডব্যান্ড, রহস্যময় মন্তব্য, চোখের দিকে আক্রমণ—এসবের মাধ্যমে তার অহঙ্কারী প্রতিপক্ষকে রাগান্বিত ও হেয় করতে চেয়েছিলেন[৮]।

মুসাশির প্রতিপক্ষরা চমকপ্রদ কৌশল, দৃষ্টিনন্দন তলোয়ার কিংবা অপ্রচলিত সব অস্ত্রের ওপর নির্ভর করছিলো। এটি ঠিক একই রকম ছিল যা দিয়ে তারা আগের যুদ্ধে লড়েছেন। তারা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং পূর্বের সফল অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করছিলেন। মুসাশি যিনি খুব কম বয়সেই স্ট্র্যাটেজির সারমর্ম বুঝে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের শক্তিমত্তাকেই তাদের পতনের কারণ বানিয়ে দিলেন।

তার প্রথম চিন্তা ছিল এমন একটি চাল চালা যা প্রতিপক্ষকে সবচেয়ে বেশি হতভম্ব করবে। এরপর তিনি নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি আবদ্ধ করে ফেলতেন। প্রতিপক্ষকে অপ্রত্যাশিত কিছুর মাধ্যমে ভারসাম্যহীন করে দেওয়ার পর তিনি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তারপর আরেকটি পদক্ষেপ নিতেন, প্রায় ক্ষেত্রেই যা ওই মুহূর্তে উদ্ভাবিত হতো। ওই পদক্ষেপ প্রতিপক্ষের ভারসাম্যহীনতাকে পরাজয় এবং মৃত্যুতে রূপান্তর করতো।

বজ্র ও বাতাস স্থায়ীত্বের প্রতীক। তেমনি একজন মহান ব্যক্তি স্থির থাকেন এবং তার দিক পরিবর্তন করেন না। কিন্তু কখনো বজ্র গর্জে ওঠে আর বাতাস বইতে থাকে। দুটিই চরম গতিশীলতার উদাহরণ। যা দেখে মনে হয় যে তা তাদের স্থায়ীত্বের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে এগুলোর আবির্ভাব ও অদৃশ্য হওয়া কিংবা আসা-যাওয়ার যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে স্থায়ী। ঠিক একইভাবে একজন মহান ব্যক্তির স্বাধীনতা তার চরিত্রের কঠোরতা বা অচল অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তিনি তো সবসময়ই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবেনই এবং তার সাথে পরিবর্তিত হবেনই। যেটা স্থায়ী সেটা হলো তার অটলতা ও তার অভ্যন্তরীণ নীতি যা তার সকল কাজকে নির্ধারণ করে দেয়।

— ই চিং, চীন, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক

যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে আপনাকে মিথ ও ভুল ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কৌশল মানে কোনো নির্দিষ্ট ধাপ বা ধারণার সিরিজ শিখে তা ঠিক মেনে চলা নয়, যা রান্নাঘরে রেসিপি বানানোর ক্ষেত্রে করা হয়। জয়ের কোনো জাদুকরী সূত্র নেই। আইডিয়াগুলো কেবল মাটির জন্য সারের মতো। এগুলো আপনার মস্তিষ্কে সম্ভাবনার আকারে থাকে, যাতে পরিস্থিতির উত্তাপে সেগুলো আপনাকে সঠিক দিশা এবং একটি উপযুক্ত ও সৃজনশীল প্রতিক্রিয়ার জন্য উৎসাহ দিতে পারে। সুতরাং বই, কৌশল, সূত্র, দৃষ্টিনন্দন অস্ত্র— এইসব কুসংস্কার ত্যাগ করুন এবং কিভাবে নিজেই একজন কৌশলী হতে হয় তা শিখুন।

সুতরাং যুদ্ধে কারও বিজয় কখনো হুবহু পুনরাবৃত্তি করা যায় না; কারণ বিজয়ের রূপ গঠিত হয় সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায়।

— সান জু, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী।

৮ কারণ রাগ আর অহঙ্কারের মধ্য হতে সঠিক কৌশল আসে না

যুদ্ধের মূল চাবিকাঠি

অতীতের কোনো অস্বস্তিকর বা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকালে আমাদের মনে অবধারিতভাবে একটা আফসোস আসে-- ইশ! আমরা যদি শুধু "ক" এর বদলে "খ" বলতাম বা করতাম; কাজটা যদি আবার করার সুযোগ পেতাম। বহু সেনাপতি যুদ্ধের উত্তাপে নিজের ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং পরে ফিরে তাকিয়ে বুঝেছেন— একটা মাত্র কৌশল বা চাল যদি বদলাতেন, তবে সবকিছুই পাল্টে যেতে পারত। এমনকি প্রিন্স হোহেনলোহেও বহু বছর পর বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি কীভাবে ভিয়ারজেনহাইলিগেন(Vierzehnheiligen) পুনর্দখলের সময় সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু সময় ফুরিয়ে সমাধান খুঁজে পাওয়ার মধ্যে মূল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হলো আমরা মনে করি যে আমাদের জ্ঞানের অভাবই ছিল। যদি আমরা আরেকটু বেশি জানতাম, আরেকটু বেশি ভেবে দেখতাম তাহলে হয়তো অন্যরকম হতো। এটা সম্পূর্ণই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা প্রথমেই ভুল করি কারণ আমরা চলমান পরিস্থিতিকে ঠিকমতো অনুভব করতে ব্যর্থ হই এবং সঙ্গে তাল ধরে রাখতে পারি না। আমরা নিজেদের ভিতরে থাকা চিন্তাকেই প্রাধান্য দেই। অতীতের ঘটনার সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখাই। বহু পূর্বে হজম করা সব তত্ত্ব ও ধারণা প্রয়োগ করি যেগুলোর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। আরও বই, আরও তত্ত্ব, আরও চিন্তা কেবল সমস্যাটাকে আরও জটিল করে তোলে।

> *আমার পলিসি হলো কোনো পলিসি না রাখা।*
>
> — আব্রাহাম লিঙ্কন, ১৮০৯–১৮৬৫

বোঝার চেষ্টা করুন, শ্রেষ্ঠ জেনারেল কিংবা সৃজনশীলতম সমরকৌশলবিদরা স্বরণীয় হন জ্ঞান বেশি থাকার জন্য নয়, বরং প্রয়োজনে নিজেদের পূর্বধারণা ত্যাগ করতে এবং বর্তমান মুহূর্তে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পারার সক্ষমতার জন্য। এভাবেই সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটে এবং সুযোগকে কাজে লাগানো যায়। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও থিওরি এগুলোর সীমাবদ্ধতা আছে। জীবনের বিশৃঙ্খলার মোকাবেলার জন্য কিংবা পরিস্থিতির অপার সম্ভাবনার জন্য আগে থেকে যতই ভাবনা রেডি রাখা হোক, তা যথেষ্ট নয়। যুদ্ধতত্ত্বের শ্রেষ্ট দার্শনিক কার্ল ভন ক্লাউজভিজ আমাদের পরিকল্পনা ও প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যকে "ঘর্ষণ" হিসেবে চিহ্নিত করেন। যেহেতু ঘর্ষণ অনিবার্য, তাই আমাদের মস্তিষ্ককে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলাতে এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। আমরা যত ভালোভাবে আমাদের চিন্তাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব, আমাদের প্রতিক্রিয়াও তত বাস্তবসম্মত হবে। আর যত বেশি আমরা পুরনো তত্ত্ব বা অতীত অভিজ্ঞতায় ডুবে থাকব, আমাদের প্রতিক্রিয়া ততই বেমানান ও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে।

অতীতে কী ভুল হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা উপকারী হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো চলমান পরিস্থিতে চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি করা। এতে আপনি বিশ্লেষণ করার মতো ভুলও অনেক কম করবেন।

> *আপনি যদি পানির ওপর একটি খালি লাউ রাখেন এবং সেটিকে স্পর্শ করেন তবে এটি একদিকে সরে যাবে। যতই চেষ্টা করুন না কেনো একে এক জায়গায় স্থির রাখতে পারবেন না। যার মন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে তার মন কোনো কিছুর সাথে এক মুহূর্তের জন্যও আটকে থাকে না। এটি পানির ওপর ভাসমান খালি লাউটারই মতো, যাকে ধাক্কা দিলে এদিক-ওদিক ভেসে বেড়ায়।*
>
> — তাকুয়ান, জাপান, ১৫৭৩–১৬৪৫

আপনার মনকে একটি নদীর মতো ভাবুন। এটি যত দ্রুত প্রবাহিত হয়, তত ভালোভাবে এটি বর্তমানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলে এবং পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দেয়। প্রবাহ যত দ্রুত হয় ততই এটি নিজেকে নবায়ন করতে পারে এবং আরো বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। আসক্তিকর চিন্তা, অতীত অভিজ্ঞতা (তা হোক আঘাত বা সাফল্য) এবং পূর্বধারণাসমূহ হলো এই নদীতে জমে থাকা বোল্ডার বা কাদার মতো— যেগুলো ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে নদীটির নাব্যতা কমিয়ে দেয়। ফলে একসময় নদী থেমে যায়; স্থবিরতা জন্ম নেয়। আপনার মনের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে আপনাকে নিরন্তর যুদ্ধ করতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হলো—এই মনের এই প্রবণতার ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা। দ্বিতীয় ধাপ হলো—কিছু কৌশল গ্রহণ করা, যা হয়তো আপনার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারে।

আপনার লালন করে রাখা সব চিন্তাধারা ও নীতিমালার পুনঃনিরীক্ষণ করুন।

নেপোলিয়নকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তিনি কোন যুদ্ধনীতিগুলো অনুসরণ করেন তিনি উত্তর জানান যে তিনি কোনো নীতিই অনুসরণ করেন না। তাঁর প্রতিভা ছিল পরিস্থিতির সঙ্গে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার সক্ষমতা এবং যা পাওয়া যায় তাকেই সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানো। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ সুযোগসন্ধানী। একইভাবে, আপনারও একমাত্র নীতি হওয়া উচিত কোনো নীতি না থাকা। কৌশলের কঠোর আইন বা চিরস্থায়ী নিয়ম আছে এই কথা বিশ্বাস করার মানে হলো নিজেকে একটি কঠিন ও স্থির অবস্থানে আটকে দেওয়া— যা আপনাকে শেষ পর্যন্ত পতনের দিকে নিয়ে যাবে। অবশ্যই ইতিহাস ও তত্ত্ব অধ্যয়ন বিশ্ব সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে সাহায্য করে, কিন্তু তত্ত্বের যে গোঁড়ামিতে রূপ নেওয়ার প্রবণতা আছে তার বিরুদ্ধে আপনাকে লড়াই করতে হবে। অতীত, ঐতিহ্য এবং পুরনো পদ্ধতিগুলোর প্রতি নির্মম হোন। নিজের ভিতরের প্রচলিত চিন্তাধারা কিংবা "পবিত্র সত্য"গুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।

আমাদের অর্জিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনেক সময় সমস্যায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে জার্মানদের বিরুদ্ধে যেসব ব্রিটিশ বাহিনী লড়ছিল তারা ট্যাংক যুদ্ধের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রশিক্ষিত ছিল। আপনি এটাও বলতে পারেন যে তারা এই কৌশলের তত্ত্বে দীক্ষিত ছিল। পরে এই অভিযানে আমেরিকান সেনারা যোগ দিল যারা এসব কৌশলে তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত ছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই আমেরিকানরা এমনভাবে অভিযোজিত লড়াই শুরু করল যা তাদেরকে ব্রিটিশদের থেকে উন্নত না করলেও সমপর্যায়ে নিয়ে গেলো। তারা এই নতুন ধরনের মরুভূমি-যুদ্ধের গতিশীলতার সাথে নিজেদের দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল। উত্তর আফ্রিকার জার্মান বাহিনীর নেতা ফিল্ড মার্শাল এরওয়িন রোমেল স্বয়ং মন্তব্য করেছিলেন: "আমেরিকানরা তাদের আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশদের তুলনায় অনেক বেশি লাভবান হয়েছে, যা এই কথাকে সত্যকে প্রমাণ করে যে নতুন শিক্ষা দেওয়া পুনরায় শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে সহজ।"

রোমেল যা বুঝিয়েছিলেন তা হলো, শিক্ষা প্রায়ই কিছু নীতি ও নিয়মকে মস্তিষ্কে এত গভীরভাবে বসিয়ে দেয় যে তা সরানো কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের মাঝখানে প্রশিক্ষিত মন এক ধাপ পিছিয়ে পড়তে পারে যদি তা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়ে অতীতের শেখা সব নিয়মকানুনকেই অনুসরণ করতে থাকে। যখন আপনি কোনো নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তখন প্রায় ক্ষেত্রেই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এটি কল্পনা করা যে আপনি কিছুই জানেন না এবং আপনাকে আবার শুরু থেকে শিখতে হবে। আপনি যা জানেন বলে ভাবতেন, এমনকি আপনার সবচেয়ে মূল্যবান ধারণাগুলোকেও মাথা থেকে সরিয়ে ফেললে বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে শেখার জন্য আপনার মস্তিষ্কে জায়গা তৈরি হবে এবং এই বর্তমান অভিজ্ঞতাক্ষেত্রটাই আপনার জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাক্ষেত্র।

এভাবে আপনি অন্যের তত্ত্ব বা বইয়ের উপর নির্ভর না করে নিজের কৌশলগত ক্ষমতা(Strategic Muscle) গড়ে তুলতে পারবেন।

সর্বশেষ যুদ্ধের স্মৃতি মাথা থেকে মুছে ফেলুন

আপনি যে সর্বশেষ যুদ্ধটি লড়েছিলেন সেটি একটি বিপদ চাই আপনি তাতে জয়লাভ করে থাকেন বা পরাজিত হন। এটি মনের মধ্যে খুব তাজা থাকে। শেষ যুদ্ধে যদি আপনি জিতে থাকেন, তাহলে আপনি ঠিক আগের ব্যবহৃত কৌশলকেই পুনরায় ব্যবহার করার প্রবণতা দেখাবেন যেহেতু সাফল্য আমাদের অলস ও আত্মতুষ্ট করে তোলে। আর যদি আপনি পরাজিত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি অস্থির ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন। শেষ যুদ্ধ নিয়ে ভাববেন না আর আপনি তা থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতেও পারবেন না। বরং যেভাবেই হোক চেষ্টা করুন সেটার স্মৃতিকে মুছে ফেলার। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় উত্তর ভিয়েতনামের শ্রেষ্ট জেনারেল ভো নগুয়েন জিয়াপ একটি সহজ নীতি অনুসরণ করতেন-- কোনো অভিযান সফল হলে তিনি নিজেকে বোঝাতেন যে সেটি আসলে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তিনি কখনো সাফল্যে আত্মহারা হয়ে যাননি এবং কখনো পরবর্তী যুদ্ধে একই কৌশল পুনরায় ব্যবহার করেননি। বরং প্রতিটি পরিস্থিতিকে তিনি নতুন করে বিশ্লেষণ করতেন।

বেসবলের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান টেড উইলিয়ামসও সর্বদা চেষ্টা করতেন তাঁর আগের ব্যাটিং মুহূর্তটি ভুলে যেতে। তিনি হোম রান করতেন বা স্ট্রাইক আউট হতেন—সবকিছু পেছনে ফেলে দিতেন। যেকোনো দুটি ব্যাটিংই এক নয়, এমনকি একই পিচারের বিরুদ্ধেও নয়। আর উইলিয়ামস চাইতেন তাঁর মন সবসময় মুক্ত থাকুক। তিনি পরের ব্যাটিংয়ের সময় ভুলতে শুরু করতেন না এবং ডাগআউটে ফিরে আসার সাথেসাথেই চলমান খেলায় মনোনিবেশ করতেন। চলমান সময়কে দখল করে রাখা বিস্তারিত বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়াটাই অতীতকে সরিয়ে রাখা এবং শেষ যুদ্ধকে ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

মস্তিষ্ককে গতিশীল রাখুন।

যখন আমরা শিশু ছিলাম, আমাদের মন কখনোই থেমে থাকত না। আমরা নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি উন্মুক্ত ছিলাম এবং যতটা সম্ভব সেগুলোকে গ্রহণ করতাম। আমরা দ্রুত শিখতাম, কারণ আমাদের চারপাশের পৃথিবী আমাদের উদ্দীপিত করত। যখনই আমরা হতাশ বা বিরক্ত হতাম তখন আমাদের চাওয়া পূরণ করার জন্য আমরা সৃজনশীল কোনো উপায় খুঁজে নিতাম এবং কোনো নতুন কিছু সামনে এসে গেলেই আমরা আগের সমস্যাটি দ্রুত ভুলে যেতাম।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, নেপোলিয়ন কিংবা মিয়ামোতো মুসাশির মতো সমস্ত শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদরা এই দিক থেকে শিশুদের মতো ছিলেন। আসলে কখনো কখনো তারা শিশুদের মতোই আচরণ করতেন। কারণ সহজ, শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদরা জিনিসগুলোকে যেমন আছে তেমনই দেখেন। তাঁরা বিপদ ও সুযোগের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হন। জীবনে কিছুই স্থির নয় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হলে মনের প্রচুর নমনীয়তা প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদরা পূর্বধারণা অনুযায়ী কাজ করেন না। তারা শিশুদের মতোই মুহূর্ত অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেন। তাদের মন সবসময় চলমান থাকে এবং তারা সবসময় উত্তেজিত ও কৌতূহলী থাকেন। তারা দ্রুত অতীত ভুলে যান— কারণ বর্তমান তাঁদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

> “পরাজয় তিক্ত। এটি সাধারণ সৈনিকের জন্য তিতা কিন্তু তার জেনারেলের জন্য আরো তিনগুণ তিতা। সৈনিক নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে এই ভেবে যে ফলাফল যাই হোক, সে তার কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। কিন্তু সেনাপতি যদি বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হন— তাহলে তো তিনি তাঁর কর্তব্যে পালনেই ব্যর্থ হয়েছেন। এর সমতুল্য আর কোনো দায়িত্ব তার নেই। তিনি অভিযানের ঘটনাগুলো মনে মনে পুনরায় ভাববেন। তিনি ভাববেন, "এখানে আমি ভুল করেছিলাম সাহসী হওয়ার বদলে ভয়কে পরামর্শদাতা বানিয়ে। ওখানে আমাকে শক্তি

> জোগাড় করার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এমন এক মুহূর্তে আমার সামনে সুযোগ এসেছিল অথচ আমি তাকে ধরতে পারিনি।" তিনি মনে করবেন সেই সৈনিকদের কথা যাদের তিনি ব্যর্থ আক্রমণে পাঠিয়েছিলেন এবং যারা আর কখনো ফিরে আসেনি। তিনি স্মরণ করবেন তাঁর প্রতি আস্থাশীল মানুষদের চোখের চাহনিকে। তিনি নিজেকে নিজে বলবেন, "আমি তাদের ব্যর্থ করেছি আর ব্যর্থ করেছি আমার দেশকেও!"। তিনি নিজেকে দেখবেন একজন পরাজিত সেনাপতি হিসেবে। এই অন্ধকার সময়গুলোতে তিনি নিজেকে ফিরে দেখবেন এবং নিজের নেতৃত্ব ও পুরুষত্বের ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকবেন।
>
> কিন্তু এখানেই তাকে থেমে যেতে হবে! বিশেষ করে যদি তিনি আবার কখনো যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করতে চান। তাঁকে এই অনুশোচনাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে যেতে হবে বিশেষ করে ঐ সময়ে, যখন এগুলো তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসকে আঁচড়ে দিতে আসবে । তাঁকে তার বিরুদ্ধে চালানো এই নফসের আক্রমণগুলো প্রতিহত করতে হবে এবং ব্যর্থতার জন্ম দেয়া সন্দেহগুলোকে বের করে দিতে হবে। পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যেতে হবে, তবে মনে রাখতে হবে শুধু এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাটা— আর এগুলো বিজয় থেকে অর্জিত শিক্ষার চেয়ে বেশি।"
>
> — Defeat Into Victory, উইলিয়াম স্লিম, ১৮৯৭–১৯৭০

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনে করতেন জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে গতিশীলতা। যা নড়ে না, তা মৃত। যার গতি ও চলন আছে, তার সম্ভাবনা বেশি, জীবনও বেশি। আমরা সবাই শৈশব বা তারুণ্যে নেপোলিয়নের মতোই গতিশীল মন নিয়ে শুরু করি কিন্তু বড় হতে হতে আমরা গতিহীন প্রুশিয়ানদের মতো হয়ে যাই। আপনি তারুণ্য থেকে হয়তো যা ফিরিয়ে আনতে চান তা হলো— আপনার পরিপাটি চেহারা, শারীরিক সক্ষমতা বা সহজ আনন্দগুলো, কিন্তু বাস্তবে আপনার সবচেয়ে বেশি দরকার মানসিক প্রবাহমানতা যা একসময় আপনার ছিল। যখনই দেখবেন আপনার চিন্তা কোনো বিশেষ জিনিসের চারপাশে ঘুরছে সেটা হতে পারে কোনো আসক্তি বা ক্ষোভ, তখন জোর করে তাকে তার বাইরে নিয়ে যান। মনকে অন্য কিছু দিয়ে ব্যস্ত করে রাখুন। শিশুর মতো এমন কিছু খুঁজুন যা আপনাকে ব্যাস্ত রাখতে পারে, এমনকিছু যাতে মনোযোগের প্রয়োজন। যা আপনি বদলাতে বা প্রভাবিত করতে পারবেন না তার পিছনে সময় নষ্ট করবেন না। শুধু চলতে থাকুন।

সময়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধারণ করুন

যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে এমন বহু ঐতিহাসিক লড়াই রয়েছে যেগুলোতে অতীত ও ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছিলো একদম আশাতীত অসমতার মধ্য দিয়ে। সপ্তম শতকে এটি ঘটেছিল যখন পারসিয়ান এবং বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী অপরাজেয় মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল যারা মরুভূমির নতুন ধাঁচের যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করছিল। তেরো শতকের প্রথম ভাগে মঙ্গোলরা তাদের অবিরাম গতিশীলতার মাধ্যমে রুশ ও ইউরোপীয়ানদের বিশাল বাহিনীকে অভিভূত করেছিল। ১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন ইয়েনার যুদ্ধে প্রুশিয়ানদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজয়ী বাহিনী কোনো নতুন প্রযুক্তি বা নতুন সামাজিক কাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এমন এক যুদ্ধশৈলী গড়ে তুলেছিল।

আপনি ছোট পরিসরে এই একই প্রভাব তৈরি করতে পারেন সময়ের চেতনার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে। যে প্রবণতাগুলো এখনো চূড়ায় পৌঁছায়নি, সেগুলো বুঝতে হলে পরিশ্রম, অধ্যয়ন এবং মানিয়ে নেওয়ার নমনীয়তা প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার স্টাইল বা কৌশলকে মাঝে মাঝে বদলানোই শ্রেয়।

নিজের স্টাইল, অভ্যাস বা কৌশল নিয়মিত বদলাতে পারলে আপনি আপনার পূর্বের "যুদ্ধগুলো"র ফাঁদ এড়াতে পারবেন। যখনই মানুষ ভাববে যে তারা আপনাকে বুঝে ফেলেছে—তখনই আপনি বদলে যাবেন।

দিক পরিবর্তন করুন[৯]

> কোনো মানুষ যদি বুঝতে পারে যে সে একটি নির্দিষ্ট হালতের মধ্যে রয়েছে, তাহলে সেই উপলব্ধিটাই ইতোমধ্যে একটি মুক্তির একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু যে মানুষ নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং নিজের সংগ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞ সে নিজেকে অন্য কিছু বানানোর চেষ্টা করে। আর সেখান থেকেই অভ্যাস তৈরি হয়। সুতরাং, আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের কোনো জিনিসকে ঠিক বাস্তবে যেরকম আছে সেভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা প্রয়োজন নিজ থেকে কোনো প্রকার প্রবণতা বা ব্যাখ্যা না দিয়ে। আর এটি করতে লাগে অসাধারণ তীক্ষ্ণ মন এবং নমনীয় হৃদয়, কারণ 'যা এই মুহুর্তে হচ্ছে' তা সর্বদা গতিশীল এবং রূপান্তরশীল। আর মনের শিকড় যদি কোনো বিশ্বাস বা জ্ঞানের মধ্যে বাঁধা থাকে তাহলে এটি 'যা এই মুহুর্তে হচ্ছে'-এর দ্রুতগতির পিছনে ছোটতে পারে না এবং তার অনুসরণ করা বন্ধ করে দেয়। আপনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে তা দেখবেন, 'যা এই মুহুর্তে হচ্ছে'- তা স্থির নয় বরং এটি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। এটি অনুসরণ করার জন্য দরকার দ্রুতগতির মন এবং নমনীয় হৃদয়—যেগুলোর অস্তিত্ব থাকেনা যখন মন কোনো বিশ্বাস, পক্ষপাত বা পরিচয়ের মধ্যে স্থির থাকে। আর শুকনো মন ও হৃদয় কখনো সহজে ও দ্রুতগতিতে 'যা এই মুহুর্তে হচ্ছে'— তার অনুসরণ করতে পারে না।
>
> — জিডু কৃষ্ণমূর্তি, ১৮৯৫–১৯৮৬

সম্পর্ক প্রায়ই বিরক্তিকর পূর্বানুমানযোগ্যতার জন্ম দেয়। কারণ আপনি তাই করেন যা সবসময় করে থাকেন আর অন্যেরাও তাঁদের সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখায়। এভাবেই চলতে থাকে। যদি আপনি হঠাৎ দিক পরিবর্তন করেন এবং নতুন ধরনের আচরণ করেন তাহলে পুরো গতিশীলতাই বদলে যায়। সম্পর্কের এই জমাট বাঁধা ধরনগুলো ভাঙার জন্য মাঝে মাঝে এমন পরিবর্তন আনুন এবং এভাবেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে।

আপনার মনকে একটি সেনাবাহিনী হিসেবে কল্পনা করুন। আধুনিক যুদ্ধের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার সাথে যুৎসই করে নিজেদের নিতে সেনাবাহিনীকে আরও তরল এবং চটপটে হতে হয়। এই বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ হলো গেরিলা যুদ্ধ—যা অগোছালো ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিশৃঙ্খলাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অগ্রসর হয়। গেরিলা বাহিনী কখনো কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা শহর রক্ষা করতে থামে না। বরং সে সবসময় চলতে চলতে এবং প্রতিপক্ষের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থেকে জিতে। কোনো স্থায়ী প্যাটার্ন না মেনে চলায় শত্রু তার ওপর নির্দিষ্ট করে লক্ষ্য স্থির করতে পারে না। গেরিলা বাহিনী কখনো একই কৌশল পুনরাবৃত্তি করে না। পরিস্থিতি, মুহূর্ত এবং যেখানে নিজেকে খুঁজে পায় সেই ভূপ্রকৃতির প্রতি সাড়া দিয়ে কাজ করে। এখানে কোনো সম্মুখসারি নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট যোগাযোগ বা সরবরাহ লাইন, নেই ধীরগতির মালবাহী গাড়ি। গেরিলা বাহিনী হলো নিখাঁদ গতিশীলতা।

এটাই আপনার নতুন চিন্তার মডেল হওয়া উচিত। কোনো কৌশলকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করবেন না। কোনো নির্দিষ্ট ধারণা বা অবস্থান রক্ষা করে কিংবা একই মৃতপ্রায় কৌশল বারবার ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনার মনকে কোনো স্থির অবস্থানে থিতু বানিয়ে ফেলবেন না। সমস্যাগুলোকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করুন। পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট এবং যা-ই আপনার সামনে আসুক তার সঙ্গে মানিয়ে নিন। অবিরাম গতিশীল থাকলে আপনার শত্রুরা আপনাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ধরতে পারবে না। ফলে আপনি পৃথিবীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে যাওয়ার চেয়ে তাকে ব্যবহার করেই আপনার গন্তব্যপানে এগিয়ে চলতে পারবেন।

---

৯ এই পাঠে দুইটি উদাহরণ ছিলো। একটি এক মৃগীরোগে আক্রান্ত রুশ ঔপন্যাসিকের জুয়ায় আসক্তি এবং আরেক হলিউডের নায়িকার ব্যাপারে। মুনাসিব বিবেচনায় অনুবাদের মধ্য তা রাখা হয়নি। কারো আগ্রহ থাকলে মূল বই থেকে দেখে নিতে পারেন - **অনুবাদক**

Image: Water.
Adapting its shape
to wherever it
moves in
the stream,
pushing
rocks out of
its way, smoothing
boulders,
it never stops,
is never the same.
The faster it moves
the clearer
it gets.

Authority: Some of our generals failed because they worked out everything by rule. They knew what Frederick did at one place, and Napoleon at another. They were always thinking about what Napoleon would do. . . . I don't underrate the value of military knowledge, but if men make war in slavish observance to rules, they will fail. . . . War is progressive. —*Ulysses S. Grant (1822–85)*

উল্টো দিক থেকে

শেষ যুদ্ধ আবার লড়ার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আপনি যখন এই ক্ষতিকর প্রবণতাকে নির্মূল করার চেষ্টা করছেন, তখন কল্পনা করতে হবে আপনার শত্রুও একই কাজ করছে। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিখতে এবং নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। ইতিহাসের অনেক ভয়াবহ সামরিক বিপর্যয় ঘটেছে শেষ যুদ্ধ লড়ার কারণে নয়, বরং এটা ধরে নেওয়ার কারণে যে প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই শেষ যুদ্ধটাই লড়বে।

১৯৯০ সালে ইরাকের সাদ্দাম হুসেন যখন কুয়েত আক্রমণ করেন, তিনি ভাবেন যে যুক্তরাষ্ট্র এখনো “ভিয়েতনাম সিনড্রোম”—অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাণহানি ও পরাজয়ের যে তীব্র মানসিক আঘাত— তা থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র হয় যুদ্ধ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাবে, নয়তো আগের মতো কেবল আকাশপথে যুদ্ধ জেতার চেষ্টা করবে এবং স্থলযুদ্ধে নামবে না। তিনি বুঝতে পারেননি যে আমেরিকান সামরিক বাহিনী ইতোমধ্যে নতুন ধরনের এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

মনে রাখবেন— যেকোনো যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু একইসঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিখে আরও শক্তিশালী হয়েও ফিরে আসতে পারে। সদা প্রস্তুত থাকুন— ভুল করলে যেনো নিরাপদ ভুলটাই হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনোই শত্রুকে আপনাকে চমকে দেয়ার সুযোগ দেবেন না।